আন্তিগোনে, পুতুল খেলা কন্যাদান, চাকভাঙা মধু এই চারটি নাটকে নারীর নিষ্কুলষ আধিপত্য কী নারীবাদকে প্রাধান্য দিয়েছে আলোচনা করো।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা বলতেন নারীর জন্মই 'প্রজনার্থং', একুইনাস বলেছিলেন নারী হল 'Healthful in the work of generenation' এবং আমাদের দেশে প্রজননের জন্য যাঁদের জন্ম সেই নারীকে নরকের দ্বার বলতে পুরুষেরা অভ্যস্ত ছিল। একুইনাসও তাই বলেছিলেন নারী হল casuse of sin' এবং তার প্রস্তাব ছিল যে নারীদের ঠাই হবে সমাজের নীচু বংশে। একুইনাসের বহুকাল পরে ফরাসী বিপ্লবের জনক রুশোও নারীকে তার যৌন পরিচিতির জন্যই পুরুষের অধীনস্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন, বায়োলজির দিক থেকে যেমন, তেমনি বিভিন্ন জন ভাষিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সংস্কৃতিক দিক থেকে নারীর হীনতাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন। একথা অবশ্যই মান্য যে কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী একই পরিবারভুক্ত হলেও নারীর ভাষা ভিন্ন হতে পারে।

এই অবস্থান থেকে নারীরা তাদের আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে থাকে। নারীরা আর পুরুষের চোখে শুধুমাত্র যৌন পরিচয়েই থাকতে চায় না, নারী তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ঘটাতে চায় আপন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তার কবিতায় লিখেছেন,

'হে বিধাতা, আমারে রেখ না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা,
উত্তরিয় জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে"

রবীন্দ্রনাথ সমাজে, সংসারে নারীর মহিমময়ী রূপের প্রশস্তি করেছেন, তিনি নারী প্রবন্ধে লিখেছেন,

> 'প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হাট হয়ে যেতে থাকে, মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বততই তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে, নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নারী আর সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, অনেক দূর পর্যন্ত নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে, জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, নারী যে আর পুরুষের হাতের খেলার পুতুল নয় সেকথা ঘোষণা করছে সদম্ভে।
আন্তিগোনে, পুতুল খেলা, কন্যাদান, চাক ভাঙা মধু, এই চারটি নাটকেই সমাজের চার অবস্থান থেক চারজন নারী তাদের আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে। আন্তিগোনে, সে সমাজের উচ্চশ্রেণিতে অবস্থান করে, পুতুলখেলা নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র বুলু (মূল নাটকে নাম ছিল নীরা, বাংলা অনুবাদে শম্ভু মিত্র তার নাম দিয়েছেন বুলু) তার সামাজিক অবস্থান নিম্ন-মধ্যবিত্তে, কন্যাদান নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র জ্যোতি সে উচ্চ-মধ্যবিত্ত পিতার একমাত্র কন্যা, আর চাক ভাঙা মধু-র কেন্দ্রিয় চরিত্র বাদামী, সমাজের প্রান্তিকে তার অবস্থান। দেখা যাচ্ছে এই চারজন নারী নাটকের ভরকেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং নাট্যঘটনা আবর্তিত হয়েছে তাদেরকে কেন্দ্র করে ও চূড়ান্ত মুহূর্ত রচিত হয়েছে।

থিবসের শাসক ক্রেয়োনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আন্তিগোনে, রাষ্ট্রশাসনকে অমান্য করে ভাই পলুনেইকেসের মৃতদেহের সৎকার করেছে। ক্রেয়োন তাদের রক্তবন্ধনকে অস্বীকার করতে চেয়েছে কিন্তু আন্তিগোনে তা মেনে নিতে পারেনি। তার কথায়, 'আমাকে ভায়ের কাছ থেকে দূরে সবারর কোন অধিকার তার নেই'। আন্তিগোনে তার কাজের সহায়ক রূপে পেতে চেয়েছেন বোন ইসমেনেকে। কিন্তু ইসমেনে রাষ্ট্র শাসনের ভয়ে দূরে সরে গেলেও আন্তিগোনে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে, প্রহরীদের দৃষ্টি এরিয়ে ভাইকে সমাধিস্থ করেছে দুবার।

রাষ্ট্র শাসনের নির্দেশ অমান্য করে মৃতদেহ সৎকার করার অপরাধে তাকে বন্দিনী হয়ে হয়েছে। তবুও তার মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই ক্রোধ নেই সে সাহসিকতার সঙ্গে স্বীকার করেছে ভাই-এর মৃতদেহ সমাধিস্থ করার কথা, শুধু তাই নয় প্রবল প্রতিবাদে ঘোষণা করেছে যে সে ভয়ে মেনে নেব না অন্যায় নির্দেশ, সে মানবে দেবতাদের শাশ্বত নিয়ম মেনেছে আপন জীবনের বিনিময়ে, এমন কি রাষ্ট্র

তার প্রেমকে অস্বীকার করলে সে জানে তার মনের প্রেমকে মারতে পারবে না রাষ্ট্রশাসন, তাই মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েও সে রাষ্ট্রের কাছে মাথা নত করেনি, এখানেই উজ্জ্বল হয়েছে তার চরিত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য।

পুতুলখেলা' নাটকে বুলুর বিদ্রোহ স্বামী তপনের বিরুদ্ধে। তপনকে সুস্থ করার জন্য বুলু যে ত্যাগ স্বীকার করে তপন তা বুঝতেই চায় না। তপন জানে বুলু তার খেলার পুতুল, অর্থাৎ নিশ্চেতন একটি পদার্থ। তপনের দৃষ্টিতে সে বেচারী বুলু' একটা নির্বোধ মেয়ে মানুষ, একজনের স্ত্রী। সন্তানের জননী, বুলুও বুঝে গেছে যে সে 'তপনের বিয়ে বিয়ে খেলার বউ।' কিন্তু বুলু একজনের স্ত্রী, সন্তানের জননী, নির্বোধ মেয়ে মানুষ হয়ে বাঁচতে চায় না, সে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নিতে চায়, বুলু ভেবেছিল তপন তাকে সে কাজে সাহায্য করবে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার সেই ভুল ভেঙে গেল সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তপনের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার।

মানুষ হিসেবে স্বামী যখন স্ত্রীর কাছে অনভিপ্রেত হয়ে পড়ে তখন স্বামী সম্পর্কিত একটা আদর্শবোধ স্ত্রীর ধ্যান দৃষ্টির সামনে একটা ছায়া রূপ ধারণ করে দাঁড়ায় এবং সেই ছায়া রূপে তার সত্যকার স্বামীর বাস্তব দোষ-ত্রুটিগুলি আচ্ছন্ন করে দেয়। কিন্তু বুলুকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বুলুর নারীবাদী চেতনা, আর তার এই চেতনার প্রকাশ ঘটেছে স্বামী নামক একটা আদর্শের কাছ থেকে যা আসলে সমাজের গড়া মিথ্যা আদর্শ।

কন্যাদান নাটকে নারী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে জ্যোতির চরিত্রে। জ্যোতি বড় হয়েছে পিতামাতার কাছ থেকে হাজারো নীতিকথা, উপদেশ শুনে শুনে। জ্যোতির কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছে তার পিতা নাথ। জ্যোতি বাড়ির অমতে দলিত শ্রেণির অরুণ আঠোলেকে বিয়ে করেছে। প্রথম প্রথম অরুণকে মানিয়ে নিতে জ্যোতির কষ্ট হয়, মাঝে মাঝেই বাবার বাড়িতে ফিরে আসে। জ্যোতির বিয়েটা তার মা এবং ভাই কেউ মেনে নিতে পারে না, তারা বার বার করে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। জ্যোত তার প্রবল প্রতিবাদ করে। সে যেহেতু আরুণ আঠোলকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় তাই মা ও ভাইয়ের আপত্তি সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করে।

আমরা প্রত্যেকেই কতকগুলি মিথ্যের মধ্যে বাস করি যে মিথ্যেগুলো পিতামাতা সন্তানের উপর চাপিয়ে দেয় সারা জীবনে কখনো হয়তো সে ভুল ভাঙে না, আবার ভাঙলেও তার প্রতিবাদ করতে পারে না। জ্যোতির যখন সেই ভুল ভাঙে তখন সে প্রবল প্রতিবাদ করে, জ্যোতি বুঝতে পারে দলিত বলে পরোক্ষে তার পিতাও অরুণকে ঘৃণা করে। জ্যোতি সেটা মেনে নিতে পারে না। তার প্রবল প্রতিবাদ করে। অরুণ জ্যোতির উপর শারীরিক অত্যাচার করে আবার তাকে প্রবল ভালোবাসে। এইকথা যখন বুঝতে পারে, তখন সে স্পষ্ট ভাষায় তার বাবাকে বলে,

> মানুষের ভিতরকার পশুত্বকে ঘুম পাড়িয়ে দেবত্বকে জাগিয়ে তোলাটা একটা অলীক কল্পনা তোমার জন্য
> ভাই, শুধু তোমার জন্য এসমস্ত কথা জানতে আমার কুড়িটা বছর লেগে গেছে।

এবং শেষ পর্যন্ত জ্যোতি ফিরে গেছে অরুণের আশ্রয়ে এবং পিতামাতার কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য নিতে অস্বীকার করে, এইভাবেই পিতামাতার অলীক ভাবনার প্রবল প্রতিবাদ জানায় জ্যোতি, যেটা পারে না তার ভাই জয়প্রকাশ।

চাক ভাঙা মধু নাটকের প্রধান চরিত্র বাদামী, সে নিম্নবিত্ত প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ। স্বামী পরিত্যাক্তা বর্তমানে পিতার আশ্রয়ে রয়েছে, সে গর্ভবতী, সংসারে নিত্য দারিদ্র্য লেগে আছে, তিন দিন ধরে পেটে কিছু পড়েনি। বাদামীদের পরিবার হচ্ছে ওঝার পরিবার সাপে কাটা রোগী বাঁচিয়ে তোলাই তাদের কাজ। গ্রামের জমিদার অঘোর ঘোষকে সাপে কাটে, তাকে বাঁচানোর জন্য বাদামীর কথা মতো তাদের বাড়ি নিয়ে আসা হয়। বাদামী নিজে জঙ্গল থেকে গাছ নিয়ে আসে। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর শেষ পর্যন্ত মাতলা অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তোলে।

প্রাণ ফিরে পেয়েই অঘোর ঘোষ মাতলা চেপে ধরে, সুদ চায়, তার দৃষ্টি পড়ে বাদামীর উপর, জীভ দিয়ে লালা নেমে আসে, বাদামীকে তার রক্ষিতা করে রাখতে চায়, মাতলা বাঁধা দিতে গেলে তার বুকে লাথি মারে। এই সমস্ত দেখে বাদামীর মধ্যে প্রবল প্রতিরোধ জেগে ওঠে। কিন্তু বাদামী জানে শারীরিক ক্ষমতায় সে অঘোর ঘোষকে পরাজিত করতে পারবে না, তাই কৌশল অবলম্বন করে। মাতলা জঙ্গল থেকে কলশী ভরে যে গোখরোটা এনেছিল তায় মধু বলে এগিয়ে দেয় অঘোর ঘোষের দিকে। কলশীর ঢাকনা খোলার পরেও সাপ উথছে না দেখে অবাক হয়, মাতলার কাছ থেকে জানতে পারে সে সাপটিকে মেরে ফেলেছে, তখন কোনো উপায় না পেয়ে কচ্ছপ ধরার সড়কি

দিয়ে গর্জন করে এগিয়ে যায় অঘোর ঘোষের দিকে। গোটা গ্রামের মানুষ বাদামীর সহায় হয়ে আসে। সড়কির আঘাতে বাদামী হত্যা করে অঘোর ঘোষকে। যে পুরুষ নারীকে তার ভোগ্য বস্তু মনে করে বাদামী তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।

আমাদের পাঠ্য চারটি নাটক চার ভাষায় এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশকালের পটভূমিকায় লেখা, কিন্তু নাটক চারটির মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা হল নারীর আপন ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে। নারী পুরুষশাসিত সমাজশৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়, পুরুষের রক্ষিতা নয়, স্বামীর হাতের পুতুল নয়, পিতামাতার আজ্ঞাবাহী নয়, সে আপন স্বাতন্ত্র্যে মহিয়ান ব্যক্তিত্বের প্রকাশে সমুচ্চয়।

আন্তিগোনে নাটকে যেরকম অত্যাচারী রূপে ক্রেয়োনকে দেখি ঠিক তেমনই অন্য নাটকগুলিতেও অত্যাচারীদের ভূমিকা লেখো।

আমাদের তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগে পাঠ্য রয়েছে পাচটি নাটক—আন্তিগোনে, হ্যামলেট, পুতুলখেলা, কন্যাদান ও চাক ভাঙা মধু; এই পাঁচটি নাটকের স্থান, কাল ও ভাষা ভিন্ন কিন্তু কোথাও একটা স্বাধর্ম রয়েছে। একদিকে যেমন নারীচেতনার বহিঃপ্রকাশের স্বাধর্ম লক্ষ করা যায় অপরদিকে তেমনি মিল রয়েছে অত্যাচারী চরিত্রের। আমরা এই পাঁচটি নাটক নিয়ে দেখার চেষ্টা করব তাদের সেই অত্যাচারীর রূপটিকে।

খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত আন্তিগোনে, এই নাটকের প্রধান চরিত্র অত্যাচারী ক্রেয়োন। যদিও নাটকের পূর্বসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে দেবতার অভিশাপে নাট্যঘটনার ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে তবুও ক্রেয়োনের অত্যাচারী রূপটিকে কোনো ভাবেই আড়াল করা যায় না। অবস্থার গতিকে ক্রেয়োন থিবসের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর থেকেই তাঁর মধ্যে ক্ষমতার লোভ উতরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই-এ দুই ভাই পলুনেইকেস এ এতোয়ক্লেস উভয়ে নিহত হলে ক্রেয়োন পক্ষপাতমূলইক আচরণ করে, এতোয়ক্লেসকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করে আর পলুনেইকেসের দেহকে শকুন কুকুরের ভোজ্যে পরিণত করতে চায়।

রক্তের টানে আন্তিগোনে এগিয়ে আসে পলুনেইকেসের দেহকে সমাধিস্থ করতে। তাঁর ফলে তাঁর উপর নেমে আসে ক্রেয়োনের অত্যাচার। আন্তিগোনে ও ইসমেনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি ইসমেনে ক্রেয়োনের অত্যাচারের ভয়ে ভাই পলুনেইকেসের দেহকে সমাধতিস্থ করতে সাহস করেনি আর ক্রেয়োনের নির্দেশ অমান্য করায় আন্তিগোনেকে গুহামুখে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। পুত্র হাইমোন তাঁর অন্যায় কাজের কথা মনে করিয়ে দিলেও ক্রেয়োন তা শুনতে চায়নি। শুধু তাই নয়, হাইমোন আন্তিগোনেকে ভালোবাসায় তাঁর উপরেও অত্যাচার মেনে আসে। অস্বীকার করে ওদের প্রেমকে। এমনকি অন্ধ ভবিষ্যতবক্তা তেইরেসিয়াসকে নানান কুকথা শোনায়, এইভাবে একের পর এক চরিত্রের উপর কখনো শারীরিক কখনো মানসিক অত্যাচার করেছে ক্রেয়োন। আর সেই অত্যাচারের ফলও পেয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর উপলব্ধি হয়েছে সে অত্যাচারী, হঠকারী, অধর্মচারী এবং তাকে নিসঙ্গ একাকী হতে হয়েছে, পুত্র, পত্নী সবাই তাঁর অত্যাচারের কারণে মৃত্যুর শিকার হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা হ্যামলেট নাটকের অত্যাচারি চরিত্র ক্লডিয়াস, সে ক্ষমতার লোভে হত্যা করেছে অগ্রজকে। ক্লডিয়াস বুঝতে পারে হ্যামলেট পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় তাঁর ফলে তাঁর উপরে নেমে আসে অত্যাচারের খাড়া। যে মুহূর্তে স্পষ্ট হয় হ্যামলেট তাকে হত্যা করতে পারে সেই মুহূর্তে কৌশলে হ্যামলেটকে পাঠিয়ে দিতে চায় নির্বাসনে যেখানে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে পুনরায় ডেনমার্কে ফিরে আসে। এখানে সে কৌশলে এবং গৌপনে ক্লডিয়াসকে হত্যা করার পরিকল্পনা করতে থাকে। ক্লডিয়াস সেকথা জেনে যাওয়ায় সেও কৌশলী হয়ে ওঠে। পোলোনিয়াসের পুত্র লিয়াটেসকে হ্যামলেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তপ্ত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ক্লডিয়াস ও হ্যামলেট দুজনেই সম্মুখ সমরে উপস্থিত হয় এবং মারা যায়।

হ্যামলেট নাটকে ক্লডিয়াস যেমন অত্যাচারী একইরকম ভাবে আমরা গারটুডকে অত্যাচারী বলতে পারি। গারটুড পুত্র হ্যামলেটের উপরে মানসিক অত্যাচার চালিয়েছে। ক্লডিয়াস যে ডেনমার্কের রাজাকে হত্যা করেছে সমস্ত কথা জানার পরেও গোনন করেছে পুত্রের কাছে, পাশাপাশি যে লোকটি তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে তাঁর সঙ্গেই আবার ঘর বেঁধেছে। গারটুডের এই আচরণে মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছে হ্যামলেট। তাই আমরা বলতে পারি ক্লডিয়াস ও গারটুড দুজনেই এই নাটকের অত্যাচারী চরিত্র।

নরওয়ের পটভূমিকায় লেখা পুতুলখেলা। এই নাটকের অত্যাচারী চরিত্রের স্বরূপটা একটু ভিন্ন, এখানে অত্যাচারী তপন। তপন ভেবেছে স্ত্রী বুলু, তার খেলার পুতুল, একবারের জন্যেও ভাবার চেষ্টা করেনি যে তার সহধর্মিনী একজন রক্তমাংসের মানুষ, তার ভালো লাগা আছে, মন্দ লাগা আছে, ভুল-ভ্রান্তি আছে, সেই সমস্তটাকে নিয়ে যদি তপন বুলুকে গ্রহণ করতে না পারে তবে চরমতমভাবে অপমানিত হয়, লাঞ্ছিত হয় তার নারীসত্তা। বুলু কিন্তু আপ্রাণভাবে চেষ্টা করে তপনকে, বাবাকে ছেলে মেয়েদের সুস্থ সবল রাখতে কিন্তু নাটকের শেষে গিয়ে আমরা লক্ষ করি বুলুর উপলব্ধিতে যে পিতৃগৃহে থাকার সময় পিতা যেরূপভাবে মেয়ের উপর মানসিক অত্যাচার করে ঠিক একইভাবে একইরকম আচরণ করে তার স্বামী। তপনকে সুস্থ করার জন্যই বুলু বাবার সই নকল করে টাকা জোগাড় করেছিল। সেই ঘটনা যখন প্রকাশ হয়ে যাবে তখন তপনের মানসম্মান হানি হবে, সেই ভয়ে সে বুলুকে অনেক কথা শোনায় অথচ একবারের জন্য ভাবার চেষ্টা করে না যে বুলু কাজটি তার জন্যই করেছিল, তখন বুলু স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—"আর তো আমি একজন নিঃসম্পর্কীয় লোকের ঘরে রাত কাটাতে পারি না।" বুলুর এই সংলাপ প্রমান করে যে তপনের দ্বারা সে কতটা মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের পটভূমিকায় রচিত কন্যাদান। এই নাটকের অত্যাচারী চরিত্র নাথ দেওলালকর। এখন প্রশ্ন হতে পারে অরুণ নয় কেন? কারণ অরুণ জ্যোতিকে প্রবলভাবে ভালোবাসে, সে যেমন মারতে মারতে ভালোবাসতেও পারে, তেমনই ভালোবাসতে ভালোবাসতে মারতেও পারে, সেটি তার সহজাত, কিন্তু নাথ বা সেবা যে অত্যাচারটা জ্যোতির সঙ্গে করে তার মধ্যে সেই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপারটা নেই। সেবা তার নিজের আত্মসম্মানের জায়গা থেকে অরুণের সঙ্গে জ্যোতির বিয়েতে আপত্তি করেছে, কারণ অরুণের মতো একজন দলিত সম্প্রদায়ের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে তাদের মাথা হেট হয়ে যাবে। একবারের জন্যেও ভাবার চেষ্টা করে না মেয়ের ভালো-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা, আর নাথ সবসময় জ্যোতিকে সাহস জুগিয়ে এলেও সেও কিন্তু একপ্রকার মানসিক অত্যাচার করে। নাটকের শেষে জ্যোতি বুঝতে পারে সেই অত্যাচারের স্বরূপ, তাই নাথকে স্পষ্ট ভাষায় দায়ী করে—

...মানুষের ভিতরকার পশুত্বকে ঘুম পাড়িয়ে দেবত্বকে জাগিয়ে তোলাটা একটা অলীক কল্পনা। তোমার জন্য ভাই, শুধু তোমার জন্য—এ সমস্ত জানতে আমার কুড়িটা বছর লেগে গেছে, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতে হয়েছে, অরুণ আঠোলে নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের প্রয়োজন হয়েছে তুমি আমাক কাছ থেকে যা লুকিয়ে রেখেছিলে সেটা অরুণ আঠোলে আমাকে দেখাল, এ ব্যাপারে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের এই বঙ্গদেশের পটভূমিকায় লেখা চাক ভাঙা মধু মনোজ মিত্রের এই নাটকে প্রধান অত্যাচারী চরিত্র অঘোর ঘোষ, তাই সেই অত্যাচারের স্বরূপ এই নাটকে জটা ফুকনা, ষষ্ঠী মাতলা এবং গ্রামবাসীদের কথাবার্তায় ও আচরণে ফুটে উঠেছে অঘোর ঘোষকে সাপে কেটেছে। তার বিষ ঝাড়াবার জন্য নিয়ে আসা হয় ওঝা মাতলার বাড়িতে।। অঘোর ঘোষ চরম অত্যাচারী জমিদার। তার অত্যাচারে গ্রামের সমস্ত মানুষ অতিষ্ট হয়েন আছে। তাই অঘোর ঘোষ মারা গেলে তারা শান্তি পাতে। অঘোর ঘোষের বাঁচা মরা নির্ভর করছে মাতলার উপর। সেই কারণে ফুকনা, ষষ্ঠী বারবার করে মাতলা, বাদামীকে এসে জানিয়ে যায় যে তারা যেন কোনোভাবেই অঘোর ঘোষকে না বাঁচায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাতলা অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তুলতে সে পূর্বমেজাজে ফিরে আসে, কথা বলতে থাকে। বেঁচে উঠেই সে মাতলাকে বলে 'দে! আমার সুদ দে!" অঘোর ঘোষ শুধু যে দরিদ্র সাধারণ মানুষদের শোষণ করত তা নয় সেই সঙ্গে সে ছিল নারীলোলুপ। বাদামীকে দেখে তার জিভ দিয়ে লালা ঝরে। সে বাদামীকে তার রক্ষিতা করে রাখতে চায়। শেষ পর্যন্ত অঘোর ঘোষকে হত্যা করে বাদামী।

উপরিউক্ত পাঁচটি নাটকের অত্যাচারী চরিত্রগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে দেখা গেল যে তাদের অত্যাচারের স্বরূপ ভিন্ন হলেও পরিণতিতে এক। কখনো পত্নী-পুত্রকে হারিয়ে একাকী নিঃসঙ্গ হতে হয়েছে, কখনো আবার মৃত্যু হয়েছে, ক্লডিয়াস এবং অঘোর ঘোষ দুজনে মারা গেছেন অত্যাচারিতদের হাতে। আর ক্রেয়োন, নাথ, তপনকে একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে প্রবেশ করতে হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে অত্যাচারের পরিণাম কখনই সুখকর হয় না। তা হয় মর্মান্তিক এবং যন্ত্রণাদায়ক, যে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো রাস্তা বা উপায় নেই।